গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা | ১৯ - ২৫ জুলাই ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল মানুষ

সরকারের হুঙ্কারই সার

আলুর দাম এখন বাড়তে বাড়তে কিলো পিছু ৩৫ টাকা ছুঁই ছুঁই। রাজ্যে তৃণমূল সরকারের এক যুগ অতিক্রান্ত। মুখ্যমন্ত্রীকে তাই চমক দিতে আগের মতো ক্যামেরা সাথে নিয়ে বাজারে যেতে হয় না। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে 'টাস্ক ফোর্স' নামে যে কিছু তৈরি হয়েছিল, মানুষ ভুলতে বসেছে। এই ক'বছরে শুধু খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাতেই মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে।

মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ আঁচ করে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের নামে নবান্নে বৈঠক হল, তার প্রচারও হল। দাম কমানোর সময় বেঁধে দেওয়া হল। হুঙ্কার উঠল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। এরপর কেটে গেল দিনের পর দিন। কাজের কাজ কিছু হল না। মানুষ জানে, দাম যদি একটু কমেও, দু'দিন পরেই আবার যে কে সেই হবে। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির পিছনে যারা আছে, নির্বাচনী লড়াইয়ে তাদের কাছ থেকেই তো বন্ড আসে, 'চাঁদা' আসে। এক নির্বাচনের পর থেকে পরের নির্বাচন পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে তার কয়েক গুণ টাকা তারা পকেটে ভরবেই। না হলে কেন তারা জোগাবে নির্বাচনে লড়ার খরচ?

মাত্র কয়েকটি খাদ্যপণ্যের চার বছরের দর

পণ্য	জুলাই '২০	জুলাই '২৪
চাল	৩২ টাকা	৪৪.৬৪ টাকা
আটা	২৭.৫৭ টাকা	৩৮.১৮ টাকা
ডাল	১০৭ টাকা	১৩১ টাকা
চিনি	৩৯.৭১ টাকা	৪৫.৯৫ টাকা
নুন	১০.৫৭ টাকা	২২.৩৮ টাকা
আলু	২২ টাকা	৩৫ টাকা
পেঁয়াজ	২২ টাকা	৪১ টাকা
টমাটো	৩৭ টাকা	৬২ টাকা
দুধ	৪১ টাকা	৫৫ টাকা
সরষের তেল	১০৭ টাকা	১৩১ টাকা

সরকারি হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি পণ্যের কেজি প্রতি দাম ধরে

এই তুলনামূলক হিসাব দেখাচ্ছে, মাত্র গত চার বছরে জিনিসপত্রের দাম কী হারে বেড়েছে! সরকারি হিসাব অনুযায়ী বাজারদর একরকম হয় আর বাস্তবে বাজারে মেলে তার থেকে অনেক বেশি দামে। তালিকা থেকে স্পষ্ট, নিত্যপ্রয়োজনীয় আরও বহু শস্য, শাক-সব্জি, মাছ-মাংস-ডিম যা বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় থাকা প্রয়োজন, সেই সমস্ত কিছুকে এই হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা নেই, বাজারদর অনুযায়ী কী ভীষণ মূল্যবৃদ্ধির বোঝা সাধারণ মানুষকে বইতে হচ্ছে এবং তা প্রতিদিন প্রতি বছর কীভাবে লাফিয়ে বাড়ছে।

এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ কী? কেন্দ্র বলে রাজ্য দায়ী, রাজ্য বলে কেন্দ্র। কখনও বলা হয়, অতিবৃষ্টিতে ফলন ভাল হয়নি তাই দাম বাড়ছে। কখনও বলা হয় বৃষ্টি ভাল না হওয়ায় ফলন ভাল হয়নি, তাই দাম বাড়ছে। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রবল দারিদ্র ও বিপুল বৈভবের সহাবস্থান পুঁজিবাদেরই বৈশিষ্ট্য

দেশে সুস্থায়ী উন্নয়নের (সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট) অগ্রগতি সংক্রান্ত ২০২৩-এর রিপোর্ট প্রকাশ করতে গিয়ে মোদি সরকারের নীতি আয়োগের সিইও বি আর সুব্রহ্মণ্যম বলেছেন, দেশে আর্থিক অসাম্য উদ্বেগের কারণ।

সুব্রহ্মণ্যমের এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রশ্নটি উঠে আসে— নীতি আয়োগ কি এই উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো অসাম্য দূর করার কোনও নিদান সরকারকে দিয়েছে? না, তেমন কোনও নিদানের কথা তাদের প্রকাশিত উন্নয়নের রিপোর্টে নেই। তা হলে নীতি আয়োগের কাজ কী? তা কি শুধু পরিস্থিতির বিবরণ দেওয়া এবং তার বিবর্ণ চিত্র দেখে উদ্বিগ্ন হওয়া?

বহুজাতিক সংবাদসংস্থা রয়টার এ বছর মে-জুন মাসে ৫১ জন অর্থনীতিবিদকে ভারতের আর্থিক ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তরগুলি পেয়েছে, তাতেই উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যেতে পারে। সংস্থার প্রশ্নের উত্তরে অর্থনীতির এই বিশেষজ্ঞদের বেশির ভাগই এ ব্যাপারে সহমত হয়েছেন যে, আগামী দিনগুলিতে ভারতের অর্থনীতিতে আয়বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকবে। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারেও সহমত যে, এই দ্রুতগতির আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও সমাজে যে আর্থিক বৈষম্য ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে তা কমবে না। বরং আগামী দিনগুলিতে তা আরও বাড়তে থাকবে।

কেন দ্রুত আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও আর্থিক অসাম্য কমবে না? দিল্লি আইআইটি-র উন্নয়ন-অর্থনীতির অধ্যাপিকা রীতিকা

দুয়ের পাতায় দেখুন

আসাম জুড়ে আন্দোলনে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা

৪ জুলাই আসামের হাটশিঙিমারির জেলাশাসকের কার্যালয় ঘেরাও। সংবাদ ৫ পাতায়

বেসরকারিকরণের লক্ষ্যেই ব্যাঙ্ক সংযুক্তি বিপন্ন গ্রাহক স্বার্থ

- **সংযুক্তিকরণের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৭ থেকে কমে ১২টি হয়েছে**
- **ব্যাঙ্কের ৩৩২১টি শাখা বন্ধ হয়েছে**
- **কমে গেছে ৭৪ হাজার কর্মী**
- **মহাজনী ঋণের খপ্পরে পড়তে চলেছে সাধারণ মানুষ**

বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে আবারও ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের রাস্তায় হাঁটতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ১২টি ব্যাঙ্ককে আপাতত ৪টি ব্যাঙ্কে আনার পরিকল্পনা তাদের। দীর্ঘকাল ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হল, সাধারণ মানুষের শ্রম এবং অর্থের বিনিময়ে রেল, ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ প্রভৃতির মতো যে সমস্ত লাভজনক সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রয়েছে সেগুলিকে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া, যাতে তারা তাদের বিপুল সম্পদের পরিমাণকে আরও বিপুলাকার দিতে পারে।

আইডিবিআই ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ পর্ব শুরু হতে চলেছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলোতেও যখন দেখা যায় খরচ কমাতে সব রকম নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্থায়ী কাজে কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' নীতিকে মান্যতা দিয়ে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে, প্রচলিত নিয়োগ পদ্ধতির বাইরে গিয়ে 'অ্যাপ্রেন্টিস'-হিসাবে কাজ করতে শিক্ষিত যুব সমাজকে আহ্বান করা হচ্ছে, তখন বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, অধিক থেকে অধিকতর মুনাফার লক্ষ্যে যারা ব্যাঙ্ক কিনতে চায়, এ হল তাদের প্রলুব্ধ করার পদক্ষেপ, সরকারি কোষাগারকে স্ফীত করার লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক শিল্পকে বেসরকারিকরণের অশনি সঙ্কেত।

দেশে ছিল ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। ২০১৭ সালে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে তা দাঁড়াল ১২টি-তে। এর ফলে গত সাত বছরে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ৩৩২১টি শাখা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে

৫ আগস্ট

সমাবেশ

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী

• রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ • বেলা ২টা

SUCI (Communist)

প্রবল দারিদ্র ও বিপুল বৈভবের সহাবস্থান

একের পাতার পর

খেরা তার উত্তরে বলেছেন, অসাম্য এমন একটা বিষয় যা আপনাআপনি দূর হয়ে যায় না। তা দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা দরকার। দেশের পরিচালক তথা নীতিনির্ধারকরা যে তা কমাতে চান, তাদের নীতি নির্ধারণ থেকে তা অন্তত বোঝা যাচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, নীতি আয়োগই হোক বা মন্ত্রিসভাই হোক, দেশ থেকে অসাম্য দূর করার কোনও পরিকল্পনা তাঁদের নেই। তা হলে কী ধরনের নীতি তাঁরা নির্ধারণ করে চলেছেন? মার্চে প্যারিস স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর 'ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব'-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে আর্থিক অসাম্য এখন ব্রিটিশ জমানার থেকেও বেশি। আর্থিক অসাম্য নিয়ে অক্সফ্যাম রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১২ থেকে ২০২১-এর মধ্যে দেশে তৈরি ৪০ শতাংশের বেশি সম্পদ ধনীতম এক শতাংশ মানুষের কুক্ষিগত হয়েছে। দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ মানুষের ভাগে জুটেছে সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশ। এই তথ্য থেকে স্পষ্ট, বর্তমান অর্থনীতি, যা আদতে একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতি, তাতে আয়বৃদ্ধি যা ঘটছে, যাকে দ্রুততম আয়বৃদ্ধি বলা হচ্ছে, তা ঘটছে কেবল সমাজের মুষ্টিমেয় ধনীতম অংশের মানুষেরই। অর্থাৎ যে নীতি নির্ধারণ এই সব আয়োগ বা কমিশনগুলি এবং মন্ত্রিসভা ও তাদের দফতরগুলি করে চলেছে তা এই ধনীতম অংশটির মুনাফাবৃদ্ধি তথা আয়বৃদ্ধির দিকে লক্ষ রেখেই।

আয়বৃদ্ধির সঙ্গে আর্থিক অসাম্যের যে সম্পর্ক ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে অসাম্য দ্রুতগতিতে বাড়ছে, তার ভিত্তি রয়েছে এই পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল নীতি তথা নিয়মের মধ্যেই। বহু আগে মানবমুক্তির দিশারি কার্ল মার্ক্স প্রমাণ করে দেখিয়ে গিয়েছেন, পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা আসে শ্রমিক তথা শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চিত তথা শোষণ করার মধ্য দিয়েই। শোষণ যত তীব্র হয় মালিকদের মুনাফা ততই বাড়ে। বর্তমানে মালিক শ্রেণি তথা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের যে আকাশছোঁয়া মুনাফাবৃদ্ধি ঘটছে, তা থেকেই স্পষ্ট যে শ্রমজীবী মানুষের উপর শোষণ কোন তীব্র মাত্রায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি দেশের অন্যতম ধনীশ্রেষ্ঠ গৌতম আদানি বর্তমান সময়টিকে ভারতীয় অর্থনীতির সবচেয়ে ভাল সময় বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, 'অর্থনীতির চলতি গতি বজায় থাকলে আগামী এক দশকে প্রতি ১২ থেকে ১৮ মাসে এক লক্ষ কোটি ডলার যুক্ত হবে ভারতীয় অর্থনীতিতে। আর ২০৫০ সালে ভারতীয় অর্থনীতি ৩০ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে যাবে।'

অর্থনীতির এই বিপুল কলেবর বৃদ্ধির যে কথা বলা হচ্ছে, তা কি সাধারণ মানুষের রোজগার, কেনাকাটা, ভোগব্যয় বাড়ার জন্য হচ্ছে? একেবারেই নয়। সাধারণ মানুষের ভোগব্যয় কমছে। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশে প্রায় ১০০ কোটি কর্মক্ষম মানুষ পরিশ্রম করে নিয়মিত দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছেন। কিন্তু তার ফলে যে আর্থিক বৃদ্ধি ঘটে চলেছে তার সুফল তাদের ঘরে পৌঁছায় না। তা চলে যায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি তথা ধনকুবেরদের দখলে।

বাস্তবে অর্থনীতির নজিরবিহীন অগ্রগতি তথা ধনকুবেরদের মুনাফাবৃদ্ধি ঘটছে দুটি উপায়ে। প্রথমটি হল, কলকারখানা, বন্দর, বিমানবন্দর রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ, যা দেশের জনগণের পরিশ্রম এবং করের টাকায় তিল তিল করে গড়ে উঠেছে সেগুলিতে ধনকুবেরদের দখল কায়েম করা, তার সাথে ধাতু, তেল, কয়লা সহ সব ধরনের খনি, নদী, জঙ্গল সহ সব রকমের প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুঠতরাজ। আর দ্বিতীয়টি হল শোষণকে সীমাহীন মাত্রায় পৌঁছে দেওয়া। ধনকুবেররা দুটিই চালাচ্ছে দেশের বর্তমান কর্ণধার তথা সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ মদতে। অর্থাৎ পরিশ্রম করে বা বৈধ উপায়ে নয়, সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং বেআইনি উপায়ে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠছে দেশের ধনকুবেররা। সেই সম্পদকে পুঁজি করে তারা দেশের অভ্যন্তরে যেমন অবাধে শোষণ-লুণ্ঠন চালাচ্ছে, সরকার তথা রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, তেমনই রাষ্ট্রের পূর্ণ মদতে পুঁজিবাদী বিশ্ববাজারে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অবতীর্ণ হয়ে দেশে দেশে ব্যবসা করছে এবং সেখানকার বিদেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল লুঠ করে আরও বিপুল সম্পদের অধিকারী হচ্ছে। আর এই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি তথা ধনকুবেরের সীমাহীন সম্পদবৃদ্ধিকেই জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধি তথা আয়বৃদ্ধি হিসাবে দেখানো হচ্ছে।

১৯৯১-এ কংগ্রেস সরকারের নয়া আর্থিক নীতি কায়েমের মধ্যে দিয়ে এই লুঠ এবং তীব্র শোষণ লাগামছাড়া আকার নিয়েছে। এই নীতির মধ্যে দিয়ে সরকার সমস্ত সরকারি সম্পত্তি, কলকারখানা, রেল, তেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, বন্দর, বনজ সম্পদ, খনি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য তাদের হাতে তুলে দিতে শুরু করে। ২০১৪-তে বিজেপির নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় বসে এই লুঠতরাজের পাশাপাশি শোষণকে তীব্র করতে শ্রম আইন বদলে ফেলে। ৪৪টি শ্রম আইন, যা শ্রমজীবী মানুষের হাতে কিছুটা হলেও অধিকার তুলে দিয়েছিল, বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল, সেগুলি সব ছেঁটে ফেলে ৪টি শ্রমকোড তৈরির মধ্যে দিয়ে বিজেপি সরকার মালিকদের হাতে অবাধ শ্রমিক শোষণের অধিকার তুলে দিয়েছে। নয়া শ্রমকোডে শ্রমিকদের বহু সংগ্রামে অর্জিত অধিকারগুলি— আট ঘণ্টা কাজের অধিকার, সংগঠিত হওয়ার অধিকার, ন্যূনতম মজুরি, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, লে-অফ, লক-আউটের ক্ষেত্রে আইন মানার বাধ্যতা প্রভৃতি বহু কিছু ছেঁটে ফেলা হয়েছে। কার্যত নয়া কোড চালু করে বিজেপি সরকার মালিকদের হাতে শ্রমিক-কর্মচারীদের শুষে ছিবড়ে করে ফেলার একচেটিয়া অধিকার দিয়ে দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই, শোষণ যতই তীব্র হচ্ছে মালিকদের মুনাফা ততই লাফিয়ে বাড়ছে। পাশাপাশি, জনগণের বৃহত্তর অংশের জন্য কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নামে সরকার যতটুকু ব্যয় করত, বিশেষত খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ প্রভৃতি পরিষেবা খাতগুলিতে, সেই সব ব্যয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছে শুধু নয়, এই সব ক্ষেত্রগুলির ব্যাপক বেসরকারিকরণের মধ্যে দিয়ে জনগণকে নিঃশেষে লুঠ করার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণিকে সুযোগ করে দিয়েছে। এই সব বহুমুখী শোষণ ও লুঠতরাজের মধ্যে দিয়েই একতরফা পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা আকাশছোঁয়া হয়ে উঠছে এবং রোজগার কমে যাওয়া, শিক্ষা-চিকিৎসা-পরিবহণ সহ পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে বিপুল ব্যয় বহন করার ফলে জনসাধারণ ক্রমাগত বেকারত্ব, দারিদ্র, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। সমাজের এই একটি ক্ষুদ্র অংশের বিপুল সম্পদবৃদ্ধিকেই সরকার এবং পুঁজিপতিরা অর্থনীতির দ্রুতগতির বৃদ্ধি এবং তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পৌঁছে যাওয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হিসাবে তুলে ধরছে— যে ভবিষ্যতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জায়গা নেই। কারণ, অসাম্যের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি সমাজ গড়েই ওঠে যেমন অন্যায়ের ভিত্তিতে, তেমনই তা সমস্ত সুযোগ এবং সুবিধাগুলি কেন্দ্রীভূত করে দেয় মুষ্টিমেয় ধনী এবং ক্ষমতাসীন মালিকদের হাতে।

এ থেকেই বোঝা যায় যে, নীতি আয়োগের শুকনো উদ্বেগের কারণ কী। নীতি আয়োগের মতো সংস্থাগুলি পুঁজিবাদী সরকারের মতোই পুঁজিপতি শ্রেণির পুঁজির অপ্রতিহত বিকাশের জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনই নীতি-নির্ধারণ করে চলে। সেই নীতিতে রাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য বড় জোর কিছু খয়রাতির ব্যবস্থা করতে পারে, রেশনের সামান্য চাল-গম ছুঁড়ে দিতে পারে, কিন্তু বৈষম্য কমানোর কোনও চেষ্টা তাতে থাকতে পারে না। জনসাধারণকে দরিদ্র অবস্থাতেই ফেলে রেখে মুনাফার রসদ হিসাবে ব্যবহার করাই তো তাদের লক্ষ্য। কিন্তু এই বৈষম্যের একটা প্রতিক্রিয়াও আছে। তা সমাজ অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বকে ক্রমাগত তীব্র করবে এবং গণবিক্ষোভের জন্ম দেবে। জন্ম দেবে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার। দিচ্ছেও।

পাঁশকুড়ায় জলনিকাশির দাবিতে বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় 'ওয়ান মেন' খাল মজে যাওয়ায় জলনিকাশি অবরুদ্ধহয়ে পড়ে ধান, বাদাম ও ফুলচাষ প্রতি বছর নষ্ট হওয়ায় সহস্রাধিক পরিবার আর্থিক সংকটে জেরবার হচ্ছে। প্রতিবাদে গড়ে উঠেছে 'নারান্দা-মহৎপুর কৃষি বাঁচাও কমিটি'। কমিটির পক্ষ থেকে ১০ জুলাই পাঁশকুড়া সেচ দপ্তরের এসডিও এবং বিডিও-র কাছে ৩ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আন্দোলনের চাপে পরদিন সেচ দপ্তরের এসডিও এবং কৃষি সেচ দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার খাল এলাকা পরিদর্শন করেন। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, 'নারান্দা-মহৎপুর কৃষি বাঁচাও কমিটি'র যুগ্ম সম্পাদক সমরেন্দ্রনাথ মাজী, দেবেন জানা প্রমুখ। আধিকারিকরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান।

জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলার জগদল্লা লোকাল কমিটির প্রবীণ আবেদনকারী সদস্য কমরেড চিত্ত শীট ২৫ জুন ভোরে বার্ধক্যজনিত কারণে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ধলডাঙা পার্টি অফিসেই থাকতেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। দীর্ঘ ৩০ বছরের বেশি সময় তিনি দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। এলাকার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতেন।

মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই এলাকার কমরেডরা ধলডাঙা অফিসে আসেন। জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শিশির কোলে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড বিদ্যুৎ শীট ও সদস্য কমরেড কৃষ্ণা শীট, কমরেড মধুমিতা কুণ্ডু ও কমরেড মাধব কুণ্ডু সহ অন্যান্য কমরেডরা একে একে মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত কমরেডের দুই ভাইয়ের পরিবারের সকল সদস্য ও আত্মীয় স্বজনেরা। পার্টি অফিস ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজন এসে প্রয়াত কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কমরেড চিত্ত শীট লাল সেলাম

পশ্চিম বর্ধমান জেলার অণ্ডাল গ্রামের নেতৃস্থানীয় কমরেড লক্ষ্মীকান্ত ধীবর ৫ এপ্রিল দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

তাঁর আদি বাড়ি বীরভূম জেলার বগুড়া গ্রামে। তিনি অণ্ডাল গ্রামে আসেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় চাকরিসূত্রে ১৯৭৩ সালে। ওই গ্রামে পার্টি সদস্য কমরেড রাজেন মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি সাধ্যমতো দলের কাজ করতেন এবং স্ত্রী-পুত্র সহ আত্মীয়স্বজনকে দলের চিন্তায় প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন। দলের নেতা-কর্মীদের জন্য তাঁর বাড়ি ছিল অবারিতদ্বার। এলাকায় বহু মানুষের প্রিয় ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন কবি ও শিল্পী। এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াতেন।

তাঁর মরদেহ বাড়িতে আনা হলে দলের জেলা সম্পাদকের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড দনা গোস্বামী ও অন্যান্য নেতারা। ৩০ জুন অণ্ডাল গ্রামের ধর্মরাজতলায় তাঁর স্মরণসভা হয়। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস বাবলা ভট্টাচার্য ও দনা গোস্বামী, দলের গোপাল মাঠ-অণ্ডাল লোকাল কমিটির সদস্য কমরেডস অম্বিকাচরণ রায়, তপন ঘোষ সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ এবং বামপন্থী ব্যক্তিবর্গ।

কমরেড লক্ষ্মীকান্ত ধীবর লাল সেলাম

“সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান আয়ত্ত করা ব্যতিরেকে বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতা সঠিকভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়”

৫ আগস্ট মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৯তম স্মরণদিবস। এই উপলক্ষে তাঁর অমূল্য শিক্ষা থেকে একটি অংশ প্রকাশ করা হল।

দল বিচারের ক্ষেত্রে এই দিকটিকে আমাদের দেশে অনেকে লক্ষই করেন না। আর, যাঁরা করেনও, তাঁরাও এটাকে অনেকটা নগণ্য ভাবে দেখেন। অথচ দল বিচার ও বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, যে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লব করবে সে যদি নিম্নতম সংস্কৃতির শিকার হয় তা হলে তার দ্বারা কোনও দিনই বিপ্লব হতে পারে না। মার্ক্স একটা কথা বলেছেন, ‘টু চেঞ্জ দি ওয়ার্লড, ওয়ার্কার্স উইল হ্যাভ টু চেঞ্জ দেমসেলভস ফার্স্ট।’ —অর্থাৎ শ্রমিকরা একমাত্র তখনই দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে পারে যখন তারা নিজেদের জীবনকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়। এই কথার মানে হচ্ছে, শ্রমিকরা চায় বলেই বা কতগুলো বিপ্লবী বুলি আওড়ানো শিখলেই দুনিয়ার পরিবর্তন আনতে পারে না। যে শ্রমিকরা দুনিয়াকে পরিবর্তন করবে, আগে তাদের নিজেদের জীবনকে পরিবর্তিত করতে হবে।

কেন মার্ক্স এ কথা বলেছিলেন? মার্ক্সের এ ভাবে বলার প্রয়োজন কী ছিল? মার্ক্স তো বলতে পারতেন যে, শ্রমিকরা তাদের বিদ্যাবুদ্ধিগত ক্ষমতার দ্বারা অথবা দৈনন্দিন সংগ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের মারফত যদি একসময় কতগুলো বিপ্লবী স্লোগান ও তত্ত্বকথা আওড়াতে পারে, তা হলেই তারা বিপ্লবটাকে কার্যকরী ভাবে রূপ দিতে পারবে। না, তা কখনও সম্ভব নয়। কারণ উন্নততর সংস্কৃতিগত মান অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান আয়ত্ত করা ব্যতিরেকে বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতাকেই সঠিকভাবে অর্জন করা যায় না এবং বিপ্লবী তত্ত্বও সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এই কারণেই বিপ্লবী রাজনীতিকে কার্যকরীভাবে রূপ দেওয়া মানেই হচ্ছে বাস্তবে জীবনটাকেই পরিবর্তিত করা লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই বিপ্লবের মধ্যে জড়িত করে। আর, এটার জন্য দরকার, প্রতিটি বিপ্লবের পূর্বে তার প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব। অথচ, যাঁরা এই সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বিপ্লব আনবেন, দলের সেই নেতা ও কর্মীরা নিজেরাই যদি বুর্জোয়া সংস্কৃতির শিকার হয়ে থাকেন তাঁদের ব্যক্তিগত অভ্যাস, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে— তা হলে তাঁরা কোনও দিনই এটা আনতে পারবেন না। এবং এ দিকটায় আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলগুলি বাইরের আন্দোলনের ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি দলের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ক্ষেত্রেও কর্মীদের, বিশেষ করে নেতাদের জীবনযাত্রা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো ও উন্নততর সাংস্কৃতিক মান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র নজর দেননি। এই ভাবে তাঁরা শুধু দেশের মানুষকেই ঠকাননি— সৎ ও সরল সাধারণ কর্মীদেরও, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে তাঁরা সব বড় বড় উজির, নাজির, মন্ত্রী হয়ে বসেছেন, তাঁদেরকেও ঠকিয়েছেন। এ কথা আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে।

আমি পূর্বেই বলেছি, শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দল হল শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক— এককথায় তার সমস্ত শ্রেণিআকাঙ্ক্ষা পূরণের হাতিয়ার। লেনিন বলেছেন, দল হল শ্রমিকশ্রেণির সবচেয়ে সচেতন বা বিপ্লবী অংশের সংগঠন, শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী বাহিনী। সেইজন্য শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দলের নেতারা সর্বহারা সংস্কৃতির প্রাণবস্তু (ক্রিম)। তাঁরা তো তাঁদের আচার আচরণে, জীবনযাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে, তা সে ব্যক্তিগত জীবনেই হোক কিংবা কোনও সামাজিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রেই হোক, সর্বহারা শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কৃতিকেই প্রতিফলিত করবেন। এই সর্বহারা শ্রেণি সংস্কৃতির মূল কথা কী? এর মূল কথা হচ্ছে, এই সংস্কৃতিকে যে আয়ত্ত করেছে, সমস্ত প্রকার সম্পত্তিবোধ থেকে সে মুক্ত। এই সম্পত্তিবোধ বলতে তার সংস্কৃতিগত, রুচিগত ধারণা ও প্রাত্যহিক আচরণগুলিও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত, অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতির প্রভাব থেকে মুক্ত।

কমিউনিস্ট সংস্কৃতি বোঝাতে গিয়ে তাই মার্ক্স যা বলেছেন, তার মর্মার্থ হল, এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত মানবতাবাদ (ইট ইজ হিউম্যানিজম মাইনাস প্রাইভেট প্রপার্টি)। তাই কোনও একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্বহারা বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট হওয়ার মূল সংগ্রামটি হল সর্বপ্রথমে শোষিত মানুষের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতি আয়ত্ত করার সাথে সাথে এই সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মান অর্জন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে এবং বিপ্লবী দলের স্বার্থে বিপ্লবী দলের কাছে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে নিঃসংশয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে আনন্দের সাথে বিসর্জন দিতে পারার সংগ্রাম। এখানে সর্বদা ব্যক্তিস্বার্থ পরিত্যাগের সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থে ‘দেশের জন্য গাড়ি, বাড়ি, ধনসম্পত্তি, জীবনের সবকিছু পরিত্যাগে’র একটা মূলগত পার্থক্য আছে। কারণ, এই ত্যাগটা যদি বুর্জোয়া চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা হলে তার দ্বারা অহমবোধ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও হামবড়া ভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তা কমিউনিস্ট হওয়ার পথে চূড়ান্ত বিপত্তি সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে, এ সংগ্রাম যে যথার্থভাবে শুরু করল সে কমিউনিস্ট চেতনার অধিকারী হওয়ার সংগ্রাম শুরু করল মাত্র এবং এ সংগ্রামে সফলতা অর্জন করার পথেই একমাত্র সত্যিকারের কমিউনিস্ট হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করা যায়। ...

প্রথমেই বোঝা দরকার কমিউনিস্ট আদর্শ ত্যাগের আদর্শ নয়। আমরা কিছুই ত্যাগ করিনি। একটা ক্ষুদ্র নোংরা জীবন ছেড়ে দিয়ে একটা বৃহত্তর-মহত্তর জীবন গ্রহণ করেছি মাত্র। একে কি কেউ ত্যাগ বলবে? ত্যাগ মানে কী? ধরুন, আপনি এখন কুঁড়েঘরে বাস করেন। আপনাকে এর বিনিময়ে একটা রাজপ্রাসাদ দিয়ে দেওয়া হল, আর আপনি আপনার ভাঙা স্যাঁতসেতে নোংরা কুঁড়েঘরটি ছেড়ে রাজপ্রাসাদে বসবাস শুরু করলেন। আপনার এ কুঁড়েঘর ছেড়ে আসাকে কি আপনি ত্যাগ মনে করবেন? কেউই করে না, আপনিও করবেন না। কারণ, ত্যাগ তো হচ্ছে কোনও কিছু না চেয়েই কিছু ছাড়া অথবা সব কিছু দিয়ে দেওয়া। এ কি তাই? আসলে তো আপনি যত ছেড়েছেন, পেয়েছেন তার অনেক বেশি। কমিউনিস্টরা তাদের বিপ্লবী জীবনকেএই রাজপ্রাসাদের জীবনের থেকেও বৃহত্তর সম্পদ বলে মনে করে। যে জীবনটাকে সে ছেড়ে এসেছে, একজন বিপ্লবীর কাছে সেটা কুঁড়েঘরের জীবনের মতো শুধু দুঃখময় ও নোংরাই নয়— ক্ষুদ্র, নীচ এবং অবমাননাকর। তাই এই দিক দিয়ে বিচার করলে একজন সত্যিকারের বিপ্লবী কিছুই ত্যাগ করেনি। বরং যা সে ছেড়ে এসেছে, অর্থাৎ গাড়ি-বাড়ি, টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, আরাম-আয়েস, তার তুলনায় সে হাজার লক্ষ গুণ বড় জিনিস পেয়েছে— সে তার আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে পেয়েছে। **বিপ্লবীদের অভাব অনটন, হাজার দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন যা দেখে সাধারণ মানুষ তাদের জন্য দুঃখ করে, সেই আপাতদৃষ্ট দুঃখময় বিপ্লবী জীবনের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থেকে একজন বিপ্লবী যে শান্তি এবং আনন্দ খুঁজে পায়, সাধারণ মানুষ বাড়ি, গাড়ি, আরামের মধ্যে তার হদিশ খুঁজে পায় না। বিপ্লবের থেকে বড় সম্পদ, বিপ্লবী জীবনের থেকে বড় জীবন তার আর কিছুই নেই।** তাই, বিপ্লবের প্রয়োজনে বিপ্লবী জীবনকে গ্রহণ করতে গিয়ে কোনও কিছু ছেড়ে আসাকেই সে ত্যাগ বলে মনে করে না এমনকি তার নিজের জীবনও নয়। তাই যদি না হত, যা তারা ছেড়ে এসেছে তার প্রতি যদি তাদের এতটুকু মমত্ব এতটুকু ক্ষোভ বা ব্যথাও কোথাও জমা হয়ে থাকত তা হলে চিনের বিপ্লবীরা একটানা তিরিশটা বছর ধরে বনে-জঙ্গলে এমন করে মরণপণ সংগ্রাম করতে পারত না। বিপ্লবী জীবনের মধ্যে একটা উঁচুদরের মর্যাদাবোধ এবং আনন্দের সন্ধান না পেলে ভিয়েতনামের বিপ্লবীরা এতবড় শক্তির বিরুদ্ধে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর ধরে এতবড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জোর খুঁজে পাচ্ছে কোথায়? **এই বিপ্লবী জীবনের আকাঙ্ক্ষা একজনের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দিলে তবেই কেবলমাত্র সে বিপ্লবী হতে পারে।** আর আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা কিছু ছাড়তে হলেই মহাত্যাগ করছেন বলে মনে করেন। কী তাঁরা ত্যাগ করেছেন? গাড়ি, বাড়ি, ধন-সম্পত্তি, আরাম— এই তো? গান্ধীবাদীরা এ দেশে সেই অর্থে অনেক বেশি ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁরা একে ত্যাগ মনে করেন কেন? যদিও এ কথা ঠিক একজন সত্যিকারের বিপ্লবী যখন বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসে, সাধারণ মানুষের জীবনের চাহিদাগুলি যখন তাঁর কাছে অপাংক্তেয় হয়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষ কমিউনিস্টদের, যাঁরা সবকিছু ছেড়ে বিপ্লবী সংগ্রামে জীবনকে নিয়োজিত করেছেন, তাঁদের সাধারণ অর্থে মহাত্যাগী বলে মনে করেন। কিন্তু একজন কমিউনিস্ট ত্যাগ অর্থে এই জিনিসটাকে নেবেন কেন? তা হলে বিপ্লবের তুলনায় এই বাড়ি, গাড়ি, ধন-সম্পত্তি, আরাম— এগুলোকেই তাঁরা বেশি মূল্যবান বলে মনে করেন— অর্থাৎ এগুলোর প্রতি তাঁদের মনের গোপন কোণে প্রবল আকর্ষণ বিদ্যমান। তাই, যাঁরা দেশের জন্য এত ত্যাগ করলেন বলে মনে করেন, বিনিময়ে তাদের আসে কিছু চাওয়ার মনোভাব— তা ধন-সম্পত্তিই হোক বা ক্ষমতা-পদই হোক। আমাদের দেশের কমিউনিস্টরাও এই ত্যাগের বিনিময়ে আজ কিছু চাইছে। তাদের ত্যাগ আজ গোটা দেশের ওপর বোঝা হয়ে দেখা দিচ্ছে।

অবশ্য এ কথাও ঠিক, তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ধন-সম্পত্তি বা ক্ষমতা-পদ এসব কিছুই চাইছেন না, তাঁরা বিপ্লবটাই চাইছেন। কিন্তু তাঁদেরও মনোভাবনা এইরকম যে, তাঁরা বিপ্লবের জন্য ব্যক্তিগত অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন বা করছেন। ত্যাগের এই মনোভাব মনের মধ্যে থেকে গেলে কী হয়? বিরুদ্ধ এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়লে, অথবা সংগ্রামের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ না হলে তাঁরা ধীরে ধীরে মানুষের ক্ষমতার (হিউম্যান এফোর্টস) ওপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। যাঁরা গাড়ি-বাড়ি চাইছেন না, ক্ষমতার লোভ বা দ্বন্দ্বের মধ্যে আসতে চাইছেন না, তেমন গান্ধীবাদীদের কী পরিণতি হয়েছে আমাদের দেশে? যদিও তাঁরা ব্যতিক্রম— ব্যতিক্রম ঐ ত্যাগীদের মধ্যে— কিন্তু মানুষের প্রতি, মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সংগ্রামের প্রতি তাঁরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। তাঁরা এক ধরনের ‘সিনিক’। কাজেই, ত্যাগধর্মের এই দু’টি চরম পরিণতি। হয় ত্যাগের বিনিময়ে আসে কিছু চাওয়ার মনোভাব— সেটা যে রূপেই হোক, আর না হয় সময়ের গতিপথে যদি জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সফলতা না আসে, তা হলে সংগ্রামের জটিল অবস্থায় ব্যর্থতার সামনে এসে হতাশা দেখা দেয়, তাঁরা মানুষের সমস্ত ক্ষমতা এবং সংগ্রামের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। আর এইরকম অবস্থায় তাঁদের একদিনের বিপ্লবী চরিত্রের গুণাবলিও মরতে থাকে এবং সেই অর্থে পূর্বের তুলনায় জীবনের ক্ষেত্রে অধঃপতনও ঘটতে থাকে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, যারা গাড়ি-বাড়ি-সম্পত্তি চাইল না ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নামল না বা বিনিময়ে ব্যক্তিগত কিছু চাইল না, তাদের ক্ষেত্রেও যদি ত্যাগ সম্পর্ক যথার্থ মার্ক্সবাদ সম্মত ধারণা না থাকে, তা হলে কী হয়? তাঁরা সব কিছু দেখে শুনে হতাশ হয়ে যান, মানুষের সমস্ত ক্ষমতা এবং সংগ্রামের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন অথবা ‘সিনিক’ হয়ে পড়েন।

‘কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একমাত্র সাম্যবাদী দল’ বই থেকে

রাহুল গান্ধী আবার প্রমাণ করলেন কংগ্রেসের রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষ নয়

সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে মানুষ মূলত বিজেপি বিরোধী ভোট দিয়েছে। আশা করেছে, দেশের একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের স্বার্থে বিজেপি যেভাবে সাধারণ মানুষের উপর শোষণের স্টিম রোলার নির্মম ভাবে চালিয়েছে তার অবসান ঘটবে। একই সাথে বিজেপির সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির অবসান চেয়েছে মানুষ। কিন্তু ভোটের পর সংসদের প্রথম অধিবেশন কি মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে এতটুকুও আশা জাগালো? বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষ কি তার একেবারে বিপরীত কোনও রাজনীতির সন্ধান মানুষকে দেওয়ার চেষ্টা করল? দেখা গেল একেবারেই তা নয়। কংগ্রেস নেতা তথা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শিবের ছবি দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন হিন্দু দেবতা শিব হিংস্র নন, কিন্তু রামের শিষ্য বিজেপি হিংস্র।

রাহুল গান্ধী বিজেপির উগ্র, হিংস্র সাম্প্রদায়িক রূপটিকে তুলে ধরতে চাইলেন ঠিকই— কিন্তু তিনি কি তার মধ্য দিয়ে কোনও বিকল্প রাজনৈতিক পথের সন্ধান দিলেন? শিবের পাশাপাশি তিনি মুসলিমদের নমাজ পড়া হাতের ছবি সহ নানা ধর্মের প্রবর্তকদের ছবি দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন তাঁদের হাতের মুদ্রার সঙ্গে কংগ্রেসের ভোট চিহ্নের প্রচুর মিল আছে। অর্থাৎ বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে কটাক্ষ করতে গিয়ে রাহুল গান্ধীর দল কংগ্রেস যে কৌশলের আশ্রয় নিল তার আর এক নাম হল নরম সাম্প্রদায়িকতা। তারা বিজেপিকে ভোটে পরাস্ত করতে চেয়েছে, তার জন্য বিজেপির ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসাতে তাদের থেকে বড় হিন্দু সাজতে চেয়েছে। একই সাথে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের ভোট পাওয়ার জন্য তাদের ধর্মীয় চিহ্নকেও তুলে ধরেছে। কিন্তু বিজেপির অনুসৃত রাজনীতিকে পরাস্ত করার কথা ভাবেনি। বিজেপির মতোই তাঁরাও এ দেশের বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাজ করা ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চেয়েছেন। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বের অধিকাংশটা জুড়ে বিজেপি বিশেষত নরেন্দ্র মোদি হিন্দু-মুসলমান, মঙ্গলসূত্র ইত্যাদি নিয়ে পড়ে ছিলেন। কংগ্রেস নেতারা এর পাল্টা হিসাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা কিছু কিছু তুলে ধরলেও তাঁরা কোন কোন মন্দিরে ঘুরছেন, তার ছবিও যাতে প্রচারিত হয় সে দিকে লক্ষ রেখেছিলেন। বাস্তবিকই যে কোনও ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের কাছে মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো যেমন প্রচারের একটা হাতিয়ার, তেমনই একই সাথে নরম হিন্দুত্ব তথা জাতপাত ও কৌশলী সাম্প্রদায়িক প্রচারও তাঁদের অন্যতম হাতিয়ার। যে কারণে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজেপি যখন তীব্র বিষোদগার করে কংগ্রেস সরাসরি তার বিরোধিতা করে না, পাছে তাদের হিন্দু ভোটব্যাঙ্কে টান পড়ে! ভোটের জন্যই কংগ্রেস অতীতে সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগাতে এমনকি দাঙ্গা বাধাতেও পিছপা ছিল না। এখন বিজেপি পুঁজিবাদের সেবার মাঠে রিলে রেসের প্রতিযোগীদের মতো কংগ্রেসের কাছ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাটনটা কেড়ে নিয়ে অনেক বেশি জোরে দৌড়চ্ছে। এটাই তফাত।

এবারের ভোটে দেখা গেল ইন্ডিয়া জোটের সব শরিক একেবারে কংগ্রেস থেকে শুরু করে তৃণমূল, অখিলেশ যাদবের সপা ইত্যাদিরা বিজেপি শাসনে মানুষের ওপর চলা অর্থনৈতিক চরম শোষণ, দারিদ্র, বেকারি নিয়ে কিছুটা প্রচার করেছে বটে, কিন্তু পাশাপাশি তাদের লক্ষ্য থেকেছে ধর্ম, জাতপাত ইত্যাদি নিয়ে প্রচার। এই রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার বিষকে আটকাতে পারে? এবারের ভোটে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এবং বিজেপি উভয় দলেরই প্রচারের মূল জোর ছিল হয় ধর্মকে কেন্দ্র করে, না হয় জাতপাত সংক্রান্ত। কংগ্রেস-সিপিএম জোটও এই লাইনের বাইরে যায়নি। অবশ্য এটাই হওয়ার ছিল। মার্ক্সবাদী বিজ্ঞান দেখিয়েছে দক্ষিণপন্থীরা তো বটেই এমনকি সংস্কারবাদী বামপন্থীরাও ভোটে লড়ে বিদ্যমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটার সেবক হওয়ার প্রতিযোগিতায় স্থান করে নেওয়ার লক্ষ্যে। একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে চলা দলগুলির রাজনীতিতে নানা বাক্যের ছটা ছাড়া পার্থক্য বিশেষ নেই।

এর একেবারে বিপরীত মেরুতে আছে বিপ্লবী বামপন্থার রাজনীতি। যে রাজনীতির বাহকরা সংসদীয় রাজনীতির ময়দানে ভোটে যখন লড়ে, তারা পুঁজিবাদের সেবক পদের ভাগিদার হওয়ার লক্ষ্যে লড়ে না। তারা লড়ে একদিকে জনসাধারণের গণআন্দোলনের দাবিকে সংসদীয় মঞ্চে জোর গলায় তুলে ধরা ও এই পুঁজিবাদী সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতারণা ও অন্তঃসারশূন্য অবস্থাটা জনগণের চোখে স্পষ্ট করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে।

এই বিপ্লবী বামপন্থার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এস ইউ সি আই (সি) একটা কথা বারবার জোর দিয়ে বলেছে— ভোটে বিজেপি-বিরোধী মানেই যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি এমনটা ধরে নেওয়া চলে না। এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের মূল সমস্যা— দারিদ্র, বেকারি, অনাহার-অর্ধাহার, কৃষকের ফসলের দাম না পাওয়া ইত্যাদি নিয়ে ভোটের বাজারে দক্ষিণপন্থী থেকে শুরু করে বামপন্থী নামধারী দলগুলি কথা বলে মানুষকে উত্তেজিত করে তাদের মন জয়ের জন্য। কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে জনগণকে সংগঠিত করে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা ও মানুষকে তাদের সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়া ও মূল শত্রু পুঁজিবাদের সেবক দলগুলিকে চেনানোর কাজটাকে তারা কৌশলে আড়াল করে। ভোট রাজনীতির ময়দানে তারা সমস্যা তুলে ধরে বলে 'ওদের বদলে আমাদের আনো' তোমাদের জীবনের সমস্যা তাতেই মিটে যাবে। ধর্মনিরপেক্ষ কথাটা মুখে বললেও তারা কখনও জাতপাতের রাজনীতি, কখনও প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়অর রাজনীতি করে। এতে বিজেপিকে ভোটে টেক্কা

পাঁচের পাতায় দেখুন

হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচতে জোট বাঁধলেন ঝাড়গ্রামের মানুষ

হাতির তাণ্ডবে ঝাড়গ্রামের কয়েকটি ব্লকে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এলাকার সবজি চাষ নষ্ট হওয়ায় কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। বুনো ছাতু (মাশরুম) কুড়িয়ে জঙ্গলমহলের বহু মানুষের যেটুকু রোজগার হত, তাও বন্ধ। হাতি ধানের বীজতলা নষ্ট করায় বেশ কিছু চাষির জমি পতিত ছিল। যখন-তখন গৃহস্থ-বাড়ি ভেঙে ধান-চাল খেয়ে যাচ্ছে হাতি। ফলচাষেরও প্রভূত ক্ষতি করছে।

সর্বোপরি বহু প্রাণহানিও ঘটেছে। গত বছর সরকারি হিসেবে হাতির হামলায় ঝাড়গ্রাম জেলায় ৬৪ জন মারা গিয়েছেন। এ বছর জুন মাসেই ৪ জন মারা গিয়েছেন। অথচ সরকার চূড়ান্ত উদাসীন। বনদপ্তর সম্পূর্ণ নীরব। স্থানীয় মানুষ বিট অফিসে অভিযোগ জানাতে গেলে কর্মচারীরা উপরওয়ালাকে জানাতে বলেন। উপরওয়ালাদের জানাতে গেলে নিচুতলার দিকে বল ঠেলে দেওয়া হয়। এই দড়ি টানাটানিতে জঙ্গলমহলের গরিব মানুষ চূড়ান্ত আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। শহরে কাজের সন্ধানে যাওয়া মানুষ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে পারবেন কি না, ছেলেমেয়েরা স্কুলে বা টিউশনে গেলে ফিরতে পারবে কি না— তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় অভিভাবকরা।

হাতি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে ৯ জুলাই ঝাড়গ্রাম ব্লকের ঢোলকাট পুকুরিয়া প্রাথমিক স্কুলের মাঠে দুই শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে তপন রায়, ধনঞ্জয় মান্না ও রতন মাহাতকে আহ্বায়ক করে 'হাতি সমস্যা বিরোধী নাগরিক কমিটি' গঠিত হয়। পাঁচ দফা দাবিতে নানা এলাকায় কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়।

তাঁদের দাবি— জঙ্গলমহল এলাকার সমস্ত দলছুট হাতিকে অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে, হাতির

গড়ে উঠল 'হাতি সমস্যা বিরোধী নাগরিক কমিটি'

আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও বরাদ্দকৃত অর্থের তালিকা প্রকাশ করতে হবে, নিহতের পরিবারকে কুড়ি লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও একজনকে স্থায়ী চাকরি দিতে হবে। আহতদের ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হবে, হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের জন্য একর প্রতি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে, প্রতিটি বিট অফিসে সরকারি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

মিড ডে মিলে বিশেষ বরাদ্দ দাবি বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির

অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে মিড ডে মিল চালু রাখতে ১০ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রাথমিকে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ সহ অবিলম্বে রান্নার গ্যাস, ডাল, ডিম, দুধ, আলু, সবজি সরবরাহের দাবি জানাল বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা বলেন, মিড ডে মিলে ১ অক্টোবর, ২০২২ থেকে মাথাপিছু বরাদ্দ প্রাথমিকে ৫.৪৫ টাকা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৮.১৭ টাকা। ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই সামান্য টাকায় পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরের কথা, শিশুদের পেট ভরাতেই শিক্ষকদের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। উদ্বেগের বিষয় যে, নির্বাচনী উৎসবে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হল কিন্তু হতভাগ্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য না কেন্দ্রীয় সরকার, না রাজ্য সরকার— কেউই সামান্য বরাদ্দও বাড়াল না।

তিনি বলেন, সরকারি স্কুলগুলিতে বর্তমানে মূলত প্রান্তিক পরিবারের শিশুরাই আসে। দেশে প্রতি ৩ জন শিশুর মধ্যে ১ জন অপুষ্ট— ইউনিসেফের এই রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও তাদের পুষ্টির দিকটি চরম উপেক্ষা করছে সরকার, যা অত্যন্ত লজ্জার।

আন্দোলনে মজুরি বাড়ল হোসিয়ারি শ্রমিকদের

দীর্ঘ আন্দোলনের জেরে অবশেষে হোসিয়ারি শ্রমিকদের ৩.৫ শতাংশ হারে মজুরি বৃদ্ধি হতে চলেছে। হোসিয়ারি শিল্পের মেকার মালিকদের সংগঠন বেঙ্গল হোসিয়ারি টেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরিত ১৮ জুনের এক নির্দেশিকা মারফত এই তথ্য জানা গেছে। গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া-ট্রাউজারের সাত রকম ভ্যারাইটির ক্ষেত্রে এই রেটবৃদ্ধি কার্যকর হবে। গত ১ জুলাই কলকাতা থেকে ওই সমস্ত জিনিসের জন্য মেকার মালিকদের যে কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়েছে, সেই জিনিসের ক্ষেত্র থেকে ওই রেটবৃদ্ধি কার্যকর হবে। ওই নিয়মে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হোসিয়ারি শ্রমিকরা ৩.৫ শতাংশ হারে বর্ধিত রেট পাবেন।

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের জেলা উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, আন্দোলনের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এতে দৈনিক মজুরি হিসাবে শ্রমিকেরা ৪১৬ টাকা পাবেন।

ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা অবিলম্বে জেলার হোসিয়ারি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বর্ধিত রেট কার্যকর করার দাবি জানান।

শাসকরা চায় মদের প্রসার রুখে দিচ্ছে মানুষ

ঘটনা এক ঃ পঁচিশ বছরের যুবক, জন্মদিনের পার্টিতে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিল। আয়োজনও মন্দ ছিল না। সঙ্গে ছিল মদ। সেটি অবশ্যই দরকার, আর কিছু থাক বা না থাক। সেই আয়োজনেই বোধহয় একটু খামতি ছিল, বা বলা ভাল, বন্ধুদের রাক্ষুসে তেষ্টার কাছে তা কম পড়ে গিয়েছিল। তারই মাশুল গুনতে হল 'বার্থ ডে বয়'-কে। পাঁচতলার উপর থেকে তাকে ফেলে দেওয়া হল নিচে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তার।

এরকমই মদ্যপ অবস্থায় নানা ধরনের অসামাজিক কাজ, ধর্ষণ, গণধর্ষণের মতো ভয়ানক ঘটনা হামেশাই ঘটে চলেছে, যা দেখে অনেকেই দুঃখ পান। সমাজটা কোথায় চলেছে বলে হা-হুতাশ করেন। কিন্তু কোনও সমাধান হয় না তাতে। ঘটনার সংখ্যা বেড়েই চলে। সরকারি উদ্যোগে খোলা হতে

থাকেই আরও মদের দোকান। উৎসবের সময় দিন রাত যাতে মদের জোগান অব্যাহত থাকে, সেদিকে কড়া নজর থাকে সরকারের। হাসপাতালে চিকিৎসা, ওষুধের জোগান না থাকলেও ক্ষতি নেই, মদের দোকান খোলা থাকা চাই— সরকারের মনোভাব এমনই। যত খুশি মদ খাও, ফুর্তি করো, অমানবিক, অসামাজিক হও, ক্ষতি নেই। মদ বিক্রি করে টাকা আসুক সরকারি ভাণ্ডারে। প্রাপ্তি আরও — মদ খেয়ে ঝিমিয়ে থাকলে বেলেল্লাপনা করবে কিন্তু চাকরি চাইবে না, ন্যায়-অন্যায়ের কথা তুলবে না, প্রতিবাদ করবে না। এমন অবস্থাই তো শাসকের আদর্শ।

ঘটনা-দুই ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সবং-এর মশাগ্রাম নামের একটি অখ্যাত গ্রাম। সেখানে সরকারি মদের দোকান খোলার প্রচেষ্টা রুখে দিলেন গ্রামেরই সাহসী কয়েকজন মহিলা। তাঁদের পাশে এক জোটে দাঁড়ালেন সাধারণ নাগরিক এবং বিশিষ্ট মানুষজন। মদের দোকান খোলার পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেই গ্রামের মানুষের উদ্যোগে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আবগারি দপ্তর, জেলাশাসক, সবং থানার বিডিও, ওসি, অঞ্চল প্রধান এবং সেখানকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার কাছে গ্রামবাসীদের স্বাক্ষর সংবলিত চিঠি দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও দশগ্রাম অঞ্চলের তৃণমূল নেতা অনন্ত তুং-কে মদের দোকান খোলার সরকারি লাইসেন্স দেওয়া হয়। তুং সাহেব আগে খাজুরি দশগ্রামে মদের দোকান খোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। গ্রামবাসীদের প্রতিরোধে খুলতে পারেননি। চলে আসেন মশাগ্রামে। এই স্থানের অদূরে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অঙ্গ নওয়াড়ি কেন্দ্র। এলাকার মানুষজন দলমত নির্বিশেষে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। মায়েরা ঝাঁটা, লাঠি নিয়ে বেরিয়ে আসেন। শুরু হয় মদের দোকানের পাশে বিক্ষোভ, মিছিল, অবস্থান। দোকানে তালা লাগিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। দেহাটি-দিঘা রাস্তা অবরোধের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে প্রশাসন মদের দোকান বন্ধকরে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। মন্ত্রীও বলতে বাধ্য হন, 'গ্রামের মানুষ চান না, তাই মশাগ্রামে আর মদের দোকান খোলা হবে না।'

কায়েমি স্বার্থবাদীরা মদের নেশায় যুবসমাজকে যতই বিপথগামী করতে চেষ্টা করুক, সমাজের ভিতরে থাকা শুভবুদ্ধির শক্তি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। দাঁড়াচ্ছেও।

কংগ্রেসের রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষ নয়

চারের পাতার পর

দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এতে সাম্প্রদায়িক পরিবেশকে মোকাবিলা করা যায় না। আজ দরকার বামগণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ জোরদার আন্দোলন। অথচ দেখা যাচ্ছে সিপিএমের মতো সংস্কারবাদী বামপন্থীরা দু'চারটি এমপি সিটে জেতার লোভে কংগ্রেসের মতো একচেটিয়া মালিকদের সেবাদাস ও জাতপাতভিত্তিক দলগুলিকেই বিজেপির বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি বলে তুলে ধরছে। এতে যেমন বিজেপির ছড়ানো সাম্প্রদায়িকতার বিষকে রোখা যাবে না, তেমনই জনগণের ঐক্যও মার খাবে। এতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়িক শক্তিরই জমি উর্বর হবে, জাতপাতের বিভাজনে বাড়বে। এ জন্যই দক্ষিণপন্থা ও সংস্কারবাদী বামপন্থার একেবারে বিপরীত মেরুর বিপ্লবী বামপন্থার রাজনীতিকে চিনতে পারা ও জনজীবনে তার প্রতিষ্ঠা জরুরি।

বিজেপির হার মানুষ চেয়েছে, তাকে ধাক্কাও দিয়েছে। কিন্তু সেই মানুষের ভোট নিয়ে কংগ্রেস নেতারা যদি শিবের ছবি দেখানোর সস্তা রাজনীতি করে কুড়িয়ে নেওয়া হাততালিতেই খুশি থাকেন, কোনও সেকুলার বামপন্থী দল কি তাদের সাথে ঐক্য করতে পারে? আজ দরকার যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা, যা ধর্মকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চর্চার বিষয় হিসাবে দেখে। একই সাথে আজ বড় দরকার গণআন্দোলনের জোয়ার তোলা।

এস ইউ সি আই (সি) সেই ডাক দিয়েছে। ছাত্র-যুব-চাষি-শ্রমিকরাও আন্দোলনে সামিল হতে এগিয়ে আসছেন। প্রয়োজন ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের সংগঠিত শক্তির জন্ম দেওয়া, তাদের সচেতন করে তোলা— যাতে জনগণ নিজেরাই যথার্থ শত্রু-মিত্র চিনতে শেখে। একমাত্র এই পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলেই শাসকশ্রেণির স্বার্থবাহী ছদ্ম জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সাহায্যে মানুষকে উলুখাগড়ার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাজনীতিকে রোখা যাবে।

শহিদ মোকাররম খাঁ স্মরণে

১০ জুলাই গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগের সাথে পালিত হল অমর শহিদ কমরেড মোকাররম খাঁ-এর ৪০তম স্মরণ দিবস।

এ দিন সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার হেড়োভাঙায় দলীয় কার্যালয়ে কমরেড মোকাররম খাঁ-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এলাকার মোটরভ্যান, টোটো এবং অটো চালক ইউনিয়নের সদস্য ও দলের কর্মীবৃন্দ। বিকালে মেরিগঞ্জ-১ অঞ্চলের খালবাড় স্কুল মাঠে স্মরণসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন মেরিগঞ্জ-১ অঞ্চলের লোকাল সম্পাদক কমরেড আইয়ুব আলি খাঁ। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য ও জননেতা কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার।

আসামে বিদ্যুৎগ্রাহকরা আন্দোলনে

৪ জুলাই আসামের দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় ৫ শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক বিভিন্ন দাবিতে হাটশিঙিমারির জেলাশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করেন। জেলার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা দীর্ঘদিন ধরে মারাত্মক লোডশেডিংয়ে ভুগছেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫-৬ ঘণ্টাও বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া মাশুল বৃদ্ধি, লো ভোল্টেজ, এস্টিমেটেড বিল এবং প্রিপেইড স্মার্ট মিটার সংযোজনের সমস্যা তো আছেই।

এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা কমিটি আন্দোলনের ডাক দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রায় গোটা জেলাই বন্যা-কবলিত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও প্রচণ্ড প্রতিকূল আবহাওয়া অগ্রাহ্য করে ওই দিন পাঁচ শতাধিক গ্রাহক এক ঘণ্টারও বেশি সময় ডিসি কার্যালয় ঘেরাও করেন।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য আহ্বায়ক অজয় আচার্য। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি দাবিপত্র জেলাশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

(ছবি প্রথম পাতায়)

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্তি

২-৩ জুলাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির সভায় সর্বসম্মত ভাবে কমরেডস নন্দ পাত্র, মৃদুল দাস ও মৃদুল সরকারকে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঢোলাহাট থানায় পিটিয়ে খুন
দোষী পুলিশদের শাস্তি দাবি সিপিডিআরএস-এর

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঢোলাহাট থানায় এক যুবককে সম্প্রতি পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ৩ জুলাই রাত সাড়ে বারোটায় কোনও অভিযোগ ছাড়াই আবু সিদ্দিকি হালদার ও তার কাকা মহসিন হালদারকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, সে দিন পুলিশ আবু সিদ্দিকি হালদারের উপর নৃশংস অত্যাচার করে। পরদিন আদালতে জামিন পেলেও ভয়ঙ্কর আহত ওই যুবকের দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা ছিল না। এই অবস্থায় বেশ কয়েকটি সরকারি হাসপাতাল ঘুরে পরিজনরা তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। ভর্তির ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর জেলা সম্পাদক জ্ঞানতোষ প্রামাণিকের নেতৃত্বে চার সদস্যের অনুসন্ধানকারী দল সেখানে যান। পুলিশ লক-আপে আবু সিদ্দিকির উপর বীভৎস অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে দোষী পুলিশদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা। সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পাঠালে কমিশন এই ঘটনাকে একটি কেস হিসাবে নথিভুক্ত করে।

সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ১১ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, দেশে নতুন ফৌজদারি আইনের বলি এই যুবক আবু সিদ্দিকি হালদার। এই আইনে কোনও অভিযোগ ছাড়াই যে কাউকে, যে কোনও সময় থানায় তুলে নিয়ে যাওয়ার অধিকার পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। এক সময় যে সব ক্ষেত্রে পুলিশকে বেআইনি কাজ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হত, সেই সমস্ত বেআইনি কাজগুলিকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে নতুন আইনে।

পাঠকের মতামত

জয়নগর-রায়দিঘি রেলপথ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ঝিমিয়ে কেন?

২০০৯ থেকে ২০২৪। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর অতিক্রান্ত। আজও এলাকাবাসীর স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গেল— রায়দিঘি-জয়নগর রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ শুরু হল না।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর-২ ব্লকের অন্তর্গত রায়দিঘি সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার। এলাকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যেও রায়দিঘি অন্যতম। প্রতিদিন এখান থেকে মথুরাপুর-১ ও ২, কুলতলি ও পাথরপ্রতিমা ব্লকের হাজার হাজার মানুষ কলকাতা সহ বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেন। এখান থেকে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা ও সন্নিহিত গভীর সমুদ্রের মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, মধু সহ অন্যান্য সামগ্রী দেশ-বিদেশে রপ্তানি হয়। রায়দিঘি থেকে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে পৃথিবীবিখ্যাত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বাদাবন, যেখানে প্রতি বছর দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক ও নানা সংস্থা আসে গবেষণা সহ নানা কাজে। এখানকার উর্বর জমিতে উৎপাদিত ধান, চাল, সব্জি ইত্যাদি দ্রব্যের শত শত টন বাইরে যায়। এখানে আছে শতাধিক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, ডিগ্রি কলেজ, বি-এড কলেজ। রয়েছে ব্যাঙ্ক সহ নানা সরকারি ও বেসরকারি অফিস। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক বা অফিস-কর্মচারী দূর-দূরান্ত থেকে যাতায়াত করেন।

সারা দিনে মাত্র একটি সরকারি বাস চলে। শ'য়ে শ'য়ে অটো, ট্রেকার, বাস, ম্যাজিক ইত্যাদি যাত্রীবাহী যানবাহন সারাদিন চলাচল করলেও সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সে সব উধাও হয়ে যায়। এর ফলে রায়দিঘি বা কলকাতাগামী যাত্রীদের চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। পরিস্থিতির বিচারে এলাকার গুরুত্ব যথেষ্ট বাড়লেও স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের মতোই থেকে গিয়েছে। সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় এখানকার বাসিন্দাদের জন্য রেলপথে যাতায়াত-ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি।

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ২০০৯ সালে রেল দপ্তরের উদ্যোগে জয়নগর থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের শিলান্যাস করেছিলেন স্থানীয় সাংসদ। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় দেড় দশক কেটে গেলেও কোনও স্তরে রেললাইন পাতার কোনও পদক্ষেপ আজও চোখে পড়ছে না। ঘটা করে পালিত শিলান্যাস অনুষ্ঠানের শিলার অস্তিত্বটুকুও আজ নেই।

এই রেলপথ সম্প্রসারণের দাবিতে স্থানীয় স্তরে এক নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। ২০১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জয়নগর-রায়দিঘি রেললাইনের কাজ দ্রুত শুরু করার দাবিতে এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে রায়দিঘি বাজারে এক প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই নাগরিক সভার দীর্ঘ ৯ বছর পরে ওই কমিটির আর কোনও কর্মসূচি চোখে পড়ছে না। এই পত্রিকার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রেল প্রশাসন সহ স্থানীয় রাজ্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, জয়নগর-রায়দিঘি রেলপথ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন ঘটে সে বিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিন। পাশাপাশি, এই রেলপথ সম্প্রসারণের বর্তমানে প্রকৃত অবস্থা কী, এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে অনুরোধ করছি স্থানীয় বিধায়ককে। সেই সঙ্গে কামনা করি, ওই রেলপথ দ্রুত সম্প্রসারণের দাবিতে নাগরিক আন্দোলন পুনর্জাগরিত হোক।

মঙ্গলকুমার দাস
রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল মানুষ

একের পাতার পর

এই দাম বৃদ্ধির কারণটা বোঝা যাবে। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে, আনাজের যখন এত দাম তখন চাষিও নিশ্চয়ই ভাল দাম পাচ্ছে? আসুন আমরা সে দিকটা একটু তাকিয়ে দেখি।

পণ্য	চাষির দাম (টাকা/কিলো)	বাজারের দাম (টাকা/কিলো)
কুমড়ো	১০-১১	৩০-৪০
আলু	১৫	৩৫-৪০
পটল	১৩	৬০-৮০
পেঁপে	১২	৫০-৬০
ঢেঁড়শ	১৫-২০	৮০-১০০
ঝিঙে	১৫-২০	৬০-৮০
কাঁচা লঙ্কা	৩৫-৪০	১৫০-১৮০
বেগুন	২০-২৫	১০০-১২০

তালিকায় দেখা যাচ্ছে, চাষির কাছ থেকে যে দামে আনাজ কেনা হচ্ছে আর যে দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে তার মধ্যে পার্থক্য বিরাট। ফসল ফলাতে যা খরচ হচ্ছে চাষি সেটুকু পর্যন্ত পাচ্ছেন না, অথচ বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম আকাশচুম্বী। তালিকা থেকে পরিষ্কার যে, মজুতদার, আড়তদার আর ফড়েদের জন্যই আনাজের এই মূল্যবৃদ্ধি। তার সঙ্গে রয়েছে পরিবহণের ব্যাপক খরচ এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে শাসক বাহিনীর তোলা আদায়।

বাজারে চাল, ডাল তেল, ডিম থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রীর দাম শুধু বেড়েই চলেছে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি আমজনতার বেঁচে থাকার উপায়টাই যেন কেড়ে নিয়েছে। গত ১০ বছরে রান্নার গ্যাসের দাম ৪১০ টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১১৬০ টাকায়। এ ক্ষেত্রে যতটুকু ভর্তুকি সাধারণ মানুষ পেত তাও তুলেই দেওয়া হয়েছে। এমনকি অসুখ হলে যে মানুষ ওষুধ খাবে, সেই উপায় পর্যন্ত নেই। সাধারণ রোগের ওষুধ থেকে জীবনদায়ী— গত পাঁচ বছরে গড় মূল্যবৃদ্ধিপ্রায় দ্বিগুণ। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য, কোনও সরকারেরই কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। আজ একপাতা প্রেসারের ওষুধের মূল্য যদি পঞ্চাশ টাকা হয়, সাতদিন পর সেই একই ওষুধ ষাট টাকা। বাড়ছে বিদ্যুতের দাম। অথচ মুখ্যমন্ত্রী নাকি কিছুই জানেন না। শিক্ষা খাতে ব্যয় বেড়েছে বিপুল। এই কঠিন পরিস্থিতিতে গরিব ও সীমিত আয়ের মানুষের কষ্ট বেড়েছে। শুধু বেড়েছে বললে ভুল হবে। গরিব ও সীমিত আয়ের মানুষের বেঁচে থাকাটাই যেন 'অসম্ভব' হয়ে উঠেছে।

মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া। অথচ মানুষের আয় কতটুকু বেড়েছে? কর্মরত মানুষের ৯০ ভাগ কাজ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। স্থায়ী কাজ প্রায় নেই। মজুরির অবস্থাও তাই। ক্ষমতায় আসার পর ২০১১ সালে রাজ্যের ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়েছিল সরকার। তারপর ২০২২ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আবার মজুরি বৃদ্ধির কথা তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী ঘোষণা করলেও তা নরেন্দ্র মোদি সরকারের মতোই ছিল 'জুমলা'। বাস্তবে ২০১১ সালের পর ১৩ বছর হয়ে গেল রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি বাড়ায়নি। কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেতন ও মজুরি যতটুকু বেড়েছে তা সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় কতটুকু?

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, দেশে অসাম্য ব্রিটিশ ভারতকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। নিচের ৫০ শতাংশ দেশবাসীর মাসিক গড় আয় মাত্র ৫৯১৭ টাকা। আর মাঝের ১০ শতাংশ মানুষের মাসিক গড় আয় মাত্র ১৩৭৫০ টাকা (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ২১-৩-২৪)। অর্থাৎ শুধু প্রান্তিক মানুষই নয়, মূল্যবৃদ্ধির কশাঘাতে মধ্যবিত্তও আজ বেসামাল।

এ রাজ্যে বাসের ভাড়া ঠিক করে বাস মালিকরা, বিদ্যুতের দাম ঠিক করে সিইএসসি-র মালিক, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ঠিক করে কালোবাজারি, মজুতদার, ব্যবসায়ীরা। সরকার যখন ঠুঁটো তখন জনগণের প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনই একমাত্র ভরসা।

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ ঃ বিপন্ন গ্রাহক স্বার্থ

একের পাতার পর

সমস্যা বেড়েছে। প্রায় ৭৪ হাজার কর্মী কমে গিয়েছে। শাখার সংখ্যা এবং কর্মী সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে নিম্নগামী হচ্ছে গ্রাহক পরিষেবার মান। যদিও পরিষেবা শুল্কের ক্ষেত্র এবং পরিমাণ— দুটোই বেড়ে চলেছে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা ইউবিআই, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের মতো অনেকগুলি ব্যাঙ্কের ওই নামে আর কোনও অস্তিত্ব নেই। সংবাদ সূত্র অনুযায়ী এ বারের পরিকল্পনা সরকারি ব্যাঙ্ক ১২ থেকে ৪-এ নামিয়ে আনা। নতুন করে এই সংযুক্তিকরণ আরও বেশি বেসরকারিকরণের লক্ষ্যেই।

প্রত্যেকটি সরকারি তথা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক শক্তপোক্ত। বেসরকারি ব্যাঙ্ক ভেঙে পড়লে তাকে বাঁচাচ্ছে, তার গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা করছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। এক সময় যখন সব ব্যাঙ্কই বেসরকারি ছিল, তখন ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং গ্রাহকদের স্বার্থ ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বলার কারণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯১৩ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের আগে এ দেশে ২১৩২টি বেসরকারি ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বলেছিল। সর্বস্বান্ত হয়েছিল ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা। ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা খুইয়েছিল তাদের চাকরি। এখন আবার সেই পথ ধরে চলার পরিকল্পনা চলছে।

ব্যাঙ্কগুলিকে জুড়ে দিয়ে বড় ব্যাঙ্কে পরিণত করার আসল কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কথায় প্রকাশ পেয়েছে। সংযুক্তিকরণের সুবিধা হিসাবে সেখানে বলা হচ্ছে, ব্যাঙ্কের বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ যা অনুৎপাদক সম্পদ বা এনপিএ-তে পরিণত হয়ে সঙ্কট সৃষ্টি করছে তার নিরসন হবে। তা ছাড়া জমা টাকা বা আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধিপাবে যা বড় ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা গড়ে তুলবে। বড় ভারতীয় ব্যাঙ্ক থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানিগুলি গ্যারান্টি বা লেটার অফ ক্রেডিট বেশি পাবে। সকলেই জানেন পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ করে না বলেই এনপিএ সঙ্কটের সৃষ্টি। আসল কথা কি তা হলে, ব্যাঙ্ক বড় না হলে বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোক্সির মতো লুঠেরারা বেশি বেশি করে লুঠ করতে পারবেন না? বড় বড় ব্যবসায়ীদের মোটা অঙ্কের ঋণের টাকা সহজে মকুব করা যাবে না? সেই জন্যই কি ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ?

বেসরকারিকরণ হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ৩১ শতাংশ গ্রামীণ শাখার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে পড়বে। অন্যান্য সমস্যাও বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে। গরিব এবং গ্রামীণ গ্রাহকদের বিরাট একটা অংশ ব্যাঙ্ক পরিষেবার বাইরে চলে যাবে। প্রান্তিক চাষি, ছোট দোকানদার, আর্থিক দিক থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির একটা বিরাট অংশও ব্যাঙ্ক-ঋণের অভাবে গ্রামীণ বিত্তশালীদের থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে সর্বস্বান্ত হবে।

দেশে মোট ব্যাঙ্ক আমানতের ৭০ শতাংশ রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে মোট জমা টাকার পরিমাণ ১০০ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। সরকারের সহায়তায় এই বিশাল পরিমাণ টাকার নিয়ন্ত্রক হতে চাইছে এ দেশের ধনকুবের গোষ্ঠী। এই টাকার উপর ভিত্তি করে ঋণ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ ক্রমবর্ধমান। এই ঋণ না আদায়ের ফলে এগুলি ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ বা এনপিএ-তে পরিণত হচ্ছে। অনাদায়ী এই সম্পদ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে দিনে দিনে দুর্বল করে দিচ্ছে। সরকার বহু ক্ষেত্রে বড় বড় কর্পোরেট ঋণ মকুব করে দিচ্ছে বা অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা কমাতে 'ব্যাড ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঘুরপথে জনগণের করের টাকায় সৃষ্ট সরকারি তহবিল থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ জোগান দিচ্ছে। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে জনগণের অর্থকে আরও যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে যাবে একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন কর্পোরেট সংস্থাগুলি।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের এই প্রচেষ্টা সফল হলে তা শুধু ব্যাঙ্ক কর্মীদের উপর আঘাত হানবে না, আঘাত হানবে ব্যাঙ্ক গ্রাহক সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপর। দেশের আর্থিক দুরবস্থা আরও ত্বরান্বিত হবে। আর্থিক বৈষম্য সমাজের বুকে আরও ভয়াবহ রূপ নেবে।

দক্ষিণপন্থা নয়, বামপন্থার রাস্তাই বেছে নিচ্ছেন মানুষ

ফ্রান্সে নির্বাচন

ফ্রান্সের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে সাড়া পড়েছে দুনিয়া জুড়ে। ইউরোপের দেশে দেশে এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টে যখন দক্ষিণপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটছে, সেই সময়ে এবারের নির্বাচনে ফ্রান্সের জাতীয় সংসদে সবচেয়ে বেশি— ১৮২টি আসন পেয়েছে বামপন্থী দলগুলির জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি)।

ফ্রান্সে এই নির্বাচন হয় দু'দফায়। ৩০ জুন প্রথম দফার নির্বাচনে মূল প্রতিযোগিতা ছিল প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁর মধ্য দক্ষিণপন্থী এনসেম্বল জোট, অতি দক্ষিণপন্থী ন্যাশনাল র‍্যালি (আরএন) এবং জঁ লুক মেলেঁশোঁর নেতৃত্বাধীন বামপন্থী জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি)-র মধ্যে। এই দফায় প্রায় ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথম স্থানে চলে যায় ন্যাশনাল র‍্যালি। এই অবস্থায় দেশে অতি-দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা তৈরি হতে ম্যাক্রঁর দল ও বামপন্থী এনএফপি দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে একজোট হয়। দুই জোটের যে যেখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সেখানে নিজেদের প্রার্থী তুলে নিয়ে একে অপরকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সেই অনুযায়ী ৭ জুলাই দ্বিতীয় দফার ভোটে দেখা যায় ন্যাশনাল র‍্যালি নেমে গেছে তৃতীয় স্থানে। আর ফ্রান্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থনে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে বামপন্থী জোট এনএফপি।

ভারতের মতো ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও গরিবি-বেকারি-মূল্যবৃদ্ধি-স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সরকারি বরাদ্দ কমে যাওয়া সহ অসংখ্য সমস্যায় সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্সের কথা ধরলে দেখা যায়, মজুরি বৃদ্ধি, অবসরের বয়স কমানো, জিনিসপত্রের দাম কমানো, চিকিৎসা, শিক্ষা সহ একের পর এক দাবিতে সেখানকার মেহনতি মানুষ গত কয়েক বছর ধরে বার বার আন্দোলনে ফেটে পড়েছে। বিক্ষোভের অভিঘাতে বার বার উত্তাল হয়েছে ফ্রান্স। একই পরিস্থিতি জার্মানি, ব্রিটেন সহ ইউরোপের অধিকাংশ দেশেরই।

শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার সরকারগুলির জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সমস্যা জর্জরিত সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সুযোগ নিয়েছে দক্ষিণপন্থী রাজনীতি। শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাটিই যে প্রতি মুহূর্তে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির জন্ম দিয়ে চলেছে, সেটা আড়াল করতে ভারতের মতো ইউরোপের দেশে দেশেও দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি জনগণের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়েছে। এ দেশের মতোই ইউরোপের দেশগুলিতেও দক্ষিণপন্থীরা জনজীবনের প্রধান সমস্যাগুলির কারণ হিসাবে দাগিয়ে দিতে চেয়েছে কোনও না কোনও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে। ভারতে দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে মুসলিম ধর্মের সংখ্যালঘু মানুষকে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের নাগরিক ওই সংখ্যালঘুদের 'অনুপ্রবেশকারী' এবং সমস্ত সমস্যার জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবল অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আরএসএস-বিজেপির মতো দক্ষিণপন্থী শক্তি। একই ভাবে ফ্রান্সে ল্য পেনের নেতৃত্বাধীন অতি-দক্ষিণপন্থী ন্যাশনাল র‍্যালি সেখানকার সাধারণ মানুষের যাবতীয় দুর্দশার জন্য দায়ী করতে চেয়েছে অভিবাসী মানুষদের। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কাজের সন্ধানে ফ্রান্সে গিয়ে এই অভিবাসীরা নিজেদের সস্তা শ্রম দিয়ে সে দেশের সম্পদ গড়ে তুলছেন। পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে ইউরোপের দেশে দেশে বর্ণবিদ্বেষের মতো কুৎসিত মানসিকতার বাড়বৃদ্ধিতে মদত দিচ্ছে দক্ষিণপন্থীরা। জনসাধারণের বিক্ষোভ যাতে সংগঠিত আন্দোলনের আকারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই টলিয়ে না দেয়, তাই পুঁজিপতি শ্রেণি এই দক্ষিণপন্থী শক্তিকে অর্থ দিয়ে, প্রচার দিয়ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করছে। জনসাধারণের একটা অংশ এতে বিভ্রান্তও হচ্ছেন। ফলে শুধু ভারতেই নয়, ফ্রান্স সহ ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ইংল্যান্ড, জার্মানির মতো দেশগুলিতেও ইদানীং দক্ষিণপন্থার বাড়বাড়ন্ত ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু পেট বড় বালাই। তাই বেকারি-গরিবি-মূল্যবৃদ্ধি-বৈষম্যের আঘাতে জর্জরিত ফ্রান্সের মেহনতি মানুষকে বার বার নামতে হয়েছে আন্দোলনের রাস্তায়। তাঁদের একটা বড় অংশ বুঝতে পেরেছেন, ঠেকে শিখেছেন যে, ন্যাশনাল র‍্যালির বিভেদমূলক, কর্পোরেটমুখী রাজনীতি তাঁদের সমস্যা সমাধানের কোনও রাস্তাই দেখাতে পারছে না। তাই তাঁরা সমবেত হয়েছেন বামপন্থীদের পতাকার নিচে। এবারের নির্বাচনে বাম-জোট এনএফপি জনসাধারণের স্বার্থবাহী নানা দাবি তুলেছিল। স্লোগান উঠেছিল— মাসিক ন্যূনতম মজুরি বাড়াতে হবে, অবসরের বয়স কমিয়ে ৬০ বছর করতে হবে, সরকারকে আগামী ৫ বছরে ১০ লক্ষ কম-ভাড়ার নতুন আবাসন তৈরি করতে হবে, খাদ্যদ্রব্য, গ্যাস ও জ্বালানির দাম বাড়ানো চলবে না ইত্যাদি। বামপন্থীরা দাবি করেছিলেন, অতি-ধনী ও অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর চাপিয়ে সরকারকে সেই টাকা জনকল্যাণে খরচ করতে হবে। ফলে সমর্থন বেড়েছে এনএফপি-র। এবারের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে পিছু হঠতে হয়েছে অতি-দক্ষিণপন্থীদের। ঠিক যেমন ভারতেও সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে হয়েছে বিজেপি-কে।

ফ্রান্সের এই বামপন্থী জোট এনএফপি গড়ে উঠেছে কমিউনিস্ট, সোসালিস্ট, পরিবেশবাদী ইত্যাদি বেশ কয়েকটি দলের ঐক্যের ভিত্তিতে। যেহেতু কোনও দলই সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি, তাই বামপন্থীদেরও ক্ষমতায় বসতে হলে বুর্জোয়াদের তল্পিবাহক ম্যাক্রঁর দলের সঙ্গে জোট করতে হবে। সে ক্ষেত্রে বামপন্থীদের তোলা দাবিগুলি কার্যকর করতে গেলে বাধা দেবে ম্যাক্রঁর দল। সে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণিও চাইবে না সেগুলি মানতে। তাই আগামী দিন কেমন যাবে তা নির্ভর করছে বামপন্থী নেতৃত্বের প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা এবং জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতার উপর। ফলে ফ্রান্সে বামপন্থীদের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সাহস কতখানি তাঁরা দেখাতে পারবেন, তার উপর নির্ভর করছে তাদের নিজেদের এবং ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ।

অতি মুনাফা করতে অনলাইন কোম্পানির মালিকরা রোবটে পরিণত করছে কর্মীদের

বিশ্বজুড়েই অনলাইনে কেনাকাটা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মোবাইলের একটা ক্লিকে কত সহজেই নানা জিনিসের অর্ডার দেওয়া যায় অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট, ওয়ালমার্ট, স্ন্যাপডিল, জিও মার্টের মতো কোনও অনলাইন কোম্পানিকে। অনলাইন শপিং এখন এমনকি মধ্যবিত্তেরও হাতের নাগালে। অর্ডারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘরের দোরগোড়ায় হাজির বাহক। এত দ্রুত জিনিসটি পৌঁছনোর পেছনে এক একজন শ্রমিকের কী পরিমাণ ঘাম-রক্ত যুক্ত হয়ে আছে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মালিক তা আদৌ ভাবে না! গ্রাহকরাও কি ভাবেন এরকম কত শ্রমিকের শ্রম লুট করে মালিকের মুনাফা আকাশচুম্বী হচ্ছে?

যে কর্মীরা স্বল্প বেতনে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ১০-১২ ঘণ্টা একটানা অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়, তারাই আসলে এই কোম্পানিগুলির 'লাইফ-লাইন'। হাজার হাজার শ্রমিকের শ্রম ছাড়া মালিকরা কি পারবে ১৪-১৫টি ফুটবল মাঠের সমান আয়তনের এক একটা গুদামের বিভিন্ন কাজ সামলাতে? এমনকি এ আই-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও মানুষের জীবন্ত শ্রমের সমান সৃজনশীল কাজ করতে পারে, এমন নমুনা নেই।

আমেরিকার মিনেসোটায় বা ভারতের মানেসরে অ্যামাজন কিংবা অন্য কোনও অনলাইন সংস্থার কর্মীদের কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা আলাদা কিছু নয়। আরও বেশি লাভ করার জন্য মালিকরা কর্মচারীদের সাথে কতটা অমানবিক আচরণ করে, জুলুম চালিয়ে তাদের শ্রমশক্তি নিংড়ে নেয়, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এখানকার শ্রমিকরা। সে জন্যই অ্যামাজনের মালিক জেফ বেজোস ২১৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার মুঠোয় পুরে বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী মানুষ হতে পারেন!

আমেরিকায় অ্যামাজনে প্রথম চাকরি পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর এক কর্মী কাজ করতে গিয়ে দেখেন, প্রতিদিন ১০ ঘণ্টার বেশি একটানা দাঁড়িয়ে প্যাকেজিং করতে হবে। প্রত্যেক কর্মীর কাজের প্রতিটি মুহূর্ত এবং কাজের হার রেকর্ড করবে সংস্থার কম্পিউটার। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিদিনের দক্ষতার উপর ও সংস্থার চাহিদা মেটানোর উপর নির্ভর করবে প্রতিটি কর্মীর পরের দিন কাজ থাকা না থাকার বিষয়টি। তা সত্ত্বেও কেউ আর্থিক দুরবস্থার কারণে, কেউ প্রবাসী হওয়ায় কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। কর্তৃপক্ষ জানে— কর্মীদের যথেচ্ছ ভাবে লুটে নিলেও তারা অভিযোগ জানাতে সাহস পাবে না, কোনও অধিকারের দাবি জানাতে পারবে না। সাহায্য করার জন্য তারা পাশে পাবে না কাউকে। ফলে কর্তৃপক্ষ সহজেই কর্মীদের বেগার খাটাতে পারে।

এরকমই বড় বড় গুদামে হাজারের বেশি কর্মচারী কাজ করেন। কোম্পানি যাদের স্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ করে, তাদের কাজের জায়গায় থাকে কনভেয়র বেল্ট, বিন ইত্যাদি। কনভেয়র বেল্টের মাধ্যমে রকমারি জিনিসে ভরা বাক্স এলে সেখান থেকে নিয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে সেগুলি রাখা ওই কর্মীদের কাজ। এরপর পাত্রগুলি ভরে গেলে রোবট এসে সেই পাত্রগুলি নিয়ে গিয়ে নতুন পাত্র হাজির করে। কর্মীদের দ্রুত লোড ও আনলোডের কাজ শিখে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে তা করতে হয়। একটানা এই কাজে তাদের শৌচাগারে যাওয়া, জল খাওয়ার জন্যও আলাদা কোনও সময় দেওয়া হয় না। গেলে কাজের সময় থেকে কেটে নেওয়া হয়। শ্রমিক-শোষণের 'স্বর্গরাজ্য' এই সংস্থাগুলি।

প্রতি সপ্তাহে, প্রতিদিন, প্রতিটি মিনিটে কর্মীদের কাজের দেখভাল করে কোম্পানি। কত দ্রুত কর্মীরা প্রতিটি জিনিস আলাদা করতে পারে কিংবা কত দ্রুত তারা গ্রাহকের দেওয়া অর্ডার গন্তব্যে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করতে পারে, তার উপর নির্ভর করে কর্মীদের দক্ষতার বিষয়টি। এক সপ্তাহ পরে সুপারভাইজাররা কর্মীদের জানিয়ে দেয়— হয় তাদের কাজের গতি বাড়াতে হবে, না হলে কাজ চলে যাবে। অন্য কারও সাহায্য ছাড়া যে কাজের গতি বাড়ানো সম্ভব নয়, কাজ চলে যাওয়ার ভয়ে তা কাউকে বলতেও পারেন না কর্মীরা। কাজ না-পসন্দ হলে স্থায়ী কর্মীদের অস্থায়ী করে কর্তৃপক্ষ তাদের উপর কাজের চাপ আরও বাড়িয়ে দেয়। বহু সময়েই ক্লান্ত, অভুক্ত অবস্থায় ঘুমোতে যেতে বাধ্য হন কর্মীরা।

প্রচণ্ড টেনশন ও চাপের কারণে কর্মীরা রাতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারেন না। যন্ত্রণাদায়ক ও নিদ্রাহীন এক একটা সপ্তাহ কাটানোর পর কাজ ভাল হচ্ছে না, এই কারণ দেখিয়ে কোনও কর্মীকে ছাঁটাইয়ের হুমকি চিঠি দেন সুপারভাইজার। স্বভাবতই কর্মীরা শুধু শারীরিক ভাবেই নয়, মানসিক ভাবেও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। আরও দু'বার এরকম হুমকি চিঠি দেওয়ার পর ছাঁটাইয়ের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয় কর্মীদের।

সোমালিয়া সহ আফ্রিকার নানা দেশ থেকে অসংখ্য গরিব মানুষ এই কোম্পানিগুলিতে কাজ করতে আসেন। কাজের চাপের সাথে সাথে তাদের উপরিপাওনা জোটে— বর্ণবিদ্বেষী বিদ্রূপ এবং ভাষা না বোঝার কারণে গালাগালি।

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 48 Bengali Weekly July 19, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

১৭০তম ‘হুল’-বার্ষিকী উদযাপিত

৩০ জুন থেকে ৭ জুলাই উৎসাহের সাথে পালিত হল ব্রিটিশ বিরোধী গণসংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ‘হুল’-এর ১৭০তম বার্ষিকী। অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির আহ্বানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হুল বার্ষিকী পালিত হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে পাঠানো সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকের চিঠি পাঠ করা হয়। চিঠিতে বলা হয়েছে, বন সংরক্ষণ রুলস-২০২২ এবং বন সংরক্ষণ সংশোধনী আইন-২০২৩ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। না হলে এই আইনের বলে দেশের কর্পোরেট পুঁজির উদগ্র মুনাফা লিপ্সার শিকার হবে ভারত তথা আপামর মানবসমাজ। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যই সামগ্রিকভাবে বিঘ্নিত হবে। দাবি করা হয়, অরণ্যের অধিকার আইন ২০০৬-এর পূর্ণ রূপায়ণ করতে হবে যার মধ্য দিয়ে আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের জীবন-জীবিকা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষিত হবে, বনভূমি রক্ষিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যরা নিজ এলাকায় সাড়ম্বরে হুল বার্ষিকী পালন করেন।

মূল্যবৃদ্ধি, মোবাইল মাশুল বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটার বসানোর প্রতিবাদে ও দুধের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে ১২ জুলাই এসইউসিআই(সি)-র নেতৃত্বে ত্রিপুরার আগরতলায় বিক্ষোভ

উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে কয়েক দিন ধরে আয়োজিত মেডিকেল ক্যাম্পে রোগী দেখছেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল। অন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি স্বাস্থ্যশিবিরে মহিলার মৃত্যুর প্রতিবাদে পথ অবরোধ

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে জানুবসান গ্রামীণ হাসপাতালে ১২ জুলাই মহিলাদের ল্যাপ লাইগেশন অপারেশন কর্মসূচিতে এক মহিলা অপারেশন টেবিলেই মারা যান। এই মৃত্যুর তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মৃত মহিলার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে ১৩ জুলাই এসইউসিআই(সি) শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক কমিটির উদ্যোগে এলাকার মানুষ তমলুক মেছেদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন ও হাসপাতালের গেটে বিক্ষোভ দেখান। বিএমওএইচ-কে ৮ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকেও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

রোবটে পরিণত করছে কর্মীদের

সাতের পাতার পর

অমানুষিক কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে দু-আড়াই বছর পর অনেকেই কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কর্মীদের সাথে অত্যন্ত অমানবিক আচরণ করে মালিকপক্ষ। তাদের দৃষ্টিতে কর্মীরা যেন এক একটা রোবট। মুনাফা আরও বাড়ানোর জন্য অ্যামাজন-কর্তৃপক্ষ কর্মীদের অযৌক্তিক কোটা করে দিয়ে অতিরিক্ত কাজ আদায়ের চেষ্টা করে। ফলে কর্মীদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। কর্তৃপক্ষ তাতে ভ্রুক্ষেপ করে না। কারণ বেকার সমস্যা এত তীব্র এবং কাজের বাজারের যে দুঃসহ অবস্থা, তাতে একদলকে কাজ থেকে ছাঁটাই করলে আর একদলকে অনায়াসেই কর্মী হিসাবে পেয়ে যায় সংস্থাগুলি।

দেশে দেশে সরকারের শ্রম দপ্তর রয়েছে, রয়েছে শ্রম আইন। রয়েছে শ্রম দপ্তরের বেশ কিছু মন্ত্রী। কিন্তু এই কর্মীদের স্বার্থে কেউই এগিয়ে আসেনি। আসলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোনও শ্রম-নীতি শ্রমিক স্বার্থে নয়, সবটাই মালিকদের স্বার্থরক্ষায়। ফলে সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে পদে পদে। তাদের শ্রমের ন্যূনতম মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, বলি দেওয়া হচ্ছে শ্রমিকের অধিকারকে। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে প্রতিটি কলে-কারখানায় মালিকের মুনাফা লালসার বলি হচ্ছে শ্রমিকের শ্রম। নির্বিচারে শ্রমিক-শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে মালিকরা। তাতে সহায়তা করছে ক্ষমতায় আসীন সরকারগুলি। এই পরিস্থিতি তীব্র শ্রমিক বিক্ষোভের জন্ম না দিয়ে পারে না। বিশ্বের দেশে দেশে এবং ভারতেও অনলাইন কোম্পানির কর্মীদের এই বিক্ষোভ লক্ষ করা যাচ্ছে।

পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ চলবে না

কোচবিহার ঃ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামল কোচবিহার ফুটপাথ ব্যবসায়ী (হকার) সংগ্রাম সমিতি। ১৮ জুলাই কোচবিহার শহরে সদর মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। পরে কাছারি মোড়ে পথ অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অন্যতম নেতা মানিক বর্মন। তিনি দাবি তোলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ফুটপাতের এক-তৃতীয়াংশ হকারদের জন্য বরাদ্দ করতে হবে এবং হকারদের সঙ্গে আলোচনা না করে তাদের উচ্ছেদ করা চলবে না। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল, যূথিকা নাথ প্রমুখ।

কোচবিহার

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ হকার আইন-২০১৪ মেনে ভেন্ডিং কমিটি গঠন এবং পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ বন্ধকরার দাবিতে ৮ জুলাই এসইউসিআই(সি) -র পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক প্রণব মাইতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রণববাবু বলেন, ভয়াবহ বেকার সমস্যার এই সময়ে যুবকরা স্বল্প পুঁজি নিয়ে রাস্তার দুপাশে ব্যবসা করছেন। উন্নয়নের নামে তাঁদের মুখের গ্রাস কেড়ে না নিয়ে উপযুক্ত পুনর্বাসন দিক সরকার।

হাওড়া ঃ হকার উচ্ছেদ, মূল্যবৃদ্ধি, হাওড়া শহরের সর্বত্র অল্প বৃষ্টিতে জল জমে যাওয়া, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, নেট ও নিট পরীক্ষায় দুর্নীতি ও প্রশ্ন ফাঁস এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলে আস্বাভাবিক ট্রেন লেট ইত্যাদির প্রতিবাদে এসইউসিআই(সি) হাওড়া সদর জেলা কমিটি ৭ জুলাই হাওড়া ময়দানে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিল হাওড়া ময়দান থেকে শুরু হয়ে মল্লিক ফটক পর্যন্ত যায়। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্ত এবং শ্রমিক নেতা কমরেড অলোক ঘোষ।

হাওড়া

চুপিসারে মাশুল বৃদ্ধি
২৪ জুলাই সিইএসসি দফতরে বিক্ষোভ অ্যাবেকার

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকার) সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস ৯ জুলাই এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, অত্যন্ত সন্তর্পণে ও প্রায় চুপিসারে গোয়েঙ্কার সিইএসসি ঘুরপথে গ্রাহকদের বিদ্যুতের বিলের উপর এফপিপিএএস-এর নাম করে অতিরিক্ত টাকার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কোনও নির্দেশ ছাড়াই এই দাম বৃদ্ধি করা হল। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে কিছু না জানার যে কথা সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, তা তাঁরই প্রশাসনের অপদার্থতার পরিচয়। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের যে ইলেকট্রিসিটি অ্যামেন্ডমেন্ট রুল ২০২২ উল্লেখ করে সিইএসসি এই দাম বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে রাজ্যে তারাই আবার প্রতিবাদের মহড়া দিচ্ছেন, যা চূড়ান্ত অনৈতিক। গত এক বছর ধরে সিইএসসি-র এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালাচ্ছে অ্যাবেকা। ২৪ জুলাই হাজার হাজার গ্রাহকের স্বাক্ষর সংবলিত ডেপুটেশন দেওয়া হবে সিইএসসি দপ্তরে।

মুখ্যমন্ত্রীর অসত্য বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে তিনি বলেন, রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির এলাকাতেও ঘুরপথে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিলের বোঝা বাড়ানো হয়েছে।

হাওড়ায় সেভ এডুকেশন কমিটির সভা

হাওড়ায় ২৬৮টি সরকারি স্কুল বন্ধ করার পরিকল্পনা, জাতীয় শিক্ষানীতি এবং নিট-নেট পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রতিবাদে ১ জুলাই জেলা সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে হাওড়া ময়দানে ঋষি অরবিন্দ ঘোষের মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র, জেলা সভাপতি অধ্যাপক বি আর প্রধান, অধ্যাপক সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন এ ডি আই সুরপতি প্রধান, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সহ জেলার বহু শিক্ষা অনুরাগী মানুষ। সভা পরিচালনা করেন জেলা সম্পাদক চণ্ডীচরণ মাইতি।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com